ধারাবাহিক রচনা

পত্রমালার আলোকে স্বামী সারদানন্দ

স্বামী চন্দ্রকান্তানন্দ

মানুষ সারদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন স্বামী সারদানন্দের গুরু, ইষ্ট, সর্বস্ব। প্রমদাদাস মিত্রকে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন : ''গুরুদেবকে দর্শন করিয়া আমাদের চক্ষু খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে ভাব আর কোথাও মেলে না এবং মিলিবার আশাও নাই।''[৭২]

শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহ ত্যাগের পর শ্রীমা সারদা দেবী হয়েছিলেন শরৎচন্দ্রের জীবনের অবলম্বন। স্বামী সারদানন্দ নিজেকে মনে করতেন শ্রীমায়ের দারোয়ান। তাঁর এই স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব শুধু দারোয়ানিতেই শেষ হত না, শ্রীমায়ের সবরকম দায়িত্ব তিনি সানন্দে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তাই শ্রীমা বলতেন : ''আমার বোঝা নিতে পারে এমন কে, দেখি না... শরৎটি সর্বপ্রকারে পারে।'' তিনি চিঠি লিখে কেশবানন্দকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, জয়রামবাটীতে থাকাকালীন শ্রীমা যদি সুস্থ থাকেন তবে প্রতি সপ্তাহে তাঁকে চিঠি লিখে সব খবর জানাতে এবং শ্রীমা অসুস্থ হলে একদিন অন্তর চিঠি লিখে জানাতে।[৭৩] সারদানন্দজী নিজেও নিয়মিত শ্রীমাকে চিঠি লিখে কুশলসংবাদ নিতেন এবং উদ্বোধন বাড়ি বা মঠের বিশেষ কোনও সংবাদ থাকলে তা শ্রীমাকে জানাতেন। শ্রীমায়ের সুবিধা-অসুবিধা সংক্রান্ত যে-কোনও তথ্য তিনি খুঁটিয়ে খোঁজ নিতেন এমনকী ''শ্রীশ্রীমার সর্দ্দি এককালে সারিয়াছে কি না জানাইবে'' বলেও নির্দেশ দিতেন।[৭৪] আসন্নপ্রসবা রাধুর জন্য শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় বাস করছিলেন। সেই সময় একদিন সন্তানসম্ভবা মাকুকে শ্রীমা উপেক্ষা করছেন, এই অভিযোগ করে নলিনীদিদি শ্রীমাকে না জানিয়েই মাকু ও তাঁর ছেলে ন্যাড়াকে নিয়ে জয়রামবাটী চলে যান। শ্রীমা সব শুনে ব্যথিত হন। খবর পেয়েই সারদানন্দজী খোঁজ নিতে লেখেন : ''নলিনী ও মাকু জয়রামবাটী গিয়াছে জানিলাম। এমন কি বিষয় লইয়া এরূপ মনান্তর ও মতান্তর হইল যাহাতে তাহারা ঐরূপ করিল? সম্ভব হইলে বিস্তারিত লিখিবে।''[৭৫] সম্ভব হলে শ্রীমায়ের শারীরিক বা সাংসারিক সামান্যতম অসুবিধার খবর পেলে তার প্রতিকারের চেষ্টা করতেন। পাগলিমামি উৎপাত করছেন খবর পেয়ে সারদানন্দজী স্বামী কেশবানন্দকে লিখেছিলেন : ''পাগলীকে আমার নাম করিয়া খুব ধমকাইবে।''[৭৬]

কোনও বিশেষ অসুবিধায় পড়লে শ্রীমার কাছে

মন্ত্রণা চাইতেন শরৎ মহারাজ, কখনও বা শ্রীমায়ের কাছে আবেদন করতেন কলকাতায় আসার জন্য। সর্বদাই তিনি শ্রীমার কৃপাপত্র প্রাপ্তির আশায় থাকতেন। শ্রীমার খুঁটিনাটি সেবা নিয়ে এত মাথা ঘামাতেন সারদানন্দজী যে তিনি নিজে বা কোনও প্রতিনিধি দ্বারা জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজার জোগাড় না পৌঁছে দিতে পারলে, ফর্দ ধরে সমস্ত কিছু কিনে, জোগাড় করে পাঠিয়ে শ্রীমাকে পত্রে জানাতেন। ৬ কার্তিক ১৩১৩ তারিখের এমনই এক চিঠিতে তিনি শ্রীমাকে লেখেন : ''মঠে এবার লোকজন কম থাকাতে জগদ্ধাত্রী পূজার জিনিসপত্র কিনে প্রসন্নমামার সঙ্গেই পাঠিয়ে দিতেছি। সকল জিনিসই বেশী বেশী পাঠাইতেছি।''[৭৭] তারপর পাঠানো সব জিনিসের একটি তালিকা দেন। মাঝে মাঝেই তিনি সুবিধামতো মানি-অর্ডারে বা লোক মারফত শ্রীমাকে টাকা পাঠাতেন এবং চিঠিতে তার উল্লেখও করতেন : ''আর সকল ভক্তেরা আপনার কাপড়ের জন্য যে টাকা দিয়েছে তাহা পরে আপনাকে মানি অর্ডারে পাঠিয়ে দিতেছি।''[৭৮]

বয়সে মাত্র তিন বছর বড় হলেও স্বামীজী ছিলেন সারদানন্দজীর 'হিরো'। তাঁর স্থূলদেহ ত্যাগে তিনি তাঁর শোকোচ্ছ্বাসে বলেছিলেন : ''বাবা, স্বামীজী চলে যাওয়াতে আমরা ভেঙে পড়েছি—আমাদের বল টুটে গেছে।'' তাঁর মহাসমাধির সংবাদ দিতে গিয়ে আমেরিকার ডা. লোগানকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : ''He entered into life Eternal''।

সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন। যে-কোনও জটিল বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তকেই মাথায় করে নিতেন। মহারাজকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : ''তুমি যেরূপ বলিবে এক্ষেত্রে আমি নিজ বুদ্ধি বিবেচনা না খাটাইয়া তাহাই করিয়া দিতে চাহি। কারণ এতদিন বুদ্ধি খাটাইয়া কিছুমাত্র ফল পাই নাই।''[৭৯]

স্বামীজী ও রাজা মহারাজ ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পার্ষদদের প্রতিও তাঁর প্রাণের টান ছিল। প্রবাসী গুরুভাই স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে লিখেছিলেন : ''আর কটা দিন আমাদের? এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিতে আর কাজ কি? কাজ যা হবার তা স্বামীজী করে গেছে—আমাদের দ্বারা যা হবে তা বোঝাই যাচ্চে! মঠে এসে থাক ও যাদের সঙ্গে এতকাল কাটিয়েছ তাদের সঙ্গে কাটিয়ে দাও—যেখানে স্বামীজী শরীর রেখেছে তার চাইতে বড় তীর্থ এক দক্ষিণেশ্বর ছাড়া আর কোথায় আছে আমি জানি না!''[৮০] আমেরিকায় সানফ্রানসিসকো শহরে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী হিন্দু মন্দির নির্মাণে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর শারীরিক কুশল কামনা করে সহকারী স্বামী প্রকাশানন্দজীকে শরৎ মহারাজ লিখেছিলেন : ''শ্রীযুক্ত ত্রিগুণাতীত স্বামীজীকে আমার নাম করিয়া মাংস খাইতে বলিবে। শরীর অসুস্থ হইলে সকল কাজ পণ্ড হইবে।... অতএব কার্য্যের দিকে এবং আমাদিগের দিকে চাহিয়া তাঁহার যাহাতে শরীর ভাল থাকে তাহা করা কর্ত্তব্য।''[৮১] এ যে তাঁর শুধু প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, তাঁর প্রাণের আকুতি তা স্পষ্ট হয় অন্যত্র তাঁর মন্তব্যে : ''মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়া সুখী করিবে এবং ত্রিগুণাতীত স্বামীজীকে বলিবে যেন নিজের শরীরের উপর একটু যত্ন রাখেন, আমাদের জন্য রাখেন।''[৮২] ভারতে ফিরে আসার পর স্বামী অভেদানন্দকে তিনি তাঁর জন্মতিথিতে নিয়মিত উপহারাদি পাঠাতেন, সঙ্গে থাকত ''অহেতুক কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদপদ্মে একত্রে বাস ও সাহচর্য্যের কথা স্মরণপূর্বক''[৮৩] শুভেচ্ছাপত্র।

কেবলমাত্র গুরুভাইদের জন্যই নয়, উদার স্বামী সারদানন্দের কল্যাণস্পৃহা সঙ্ঘে তাঁর অনুজদের প্রতিও বর্ষিত হত। আমেরিকা-প্রবাসী স্বামী প্রকাশানন্দজীকে লিখেছিলেন : ''অনেকদিন তোমাদের দেখি নাই। দেখিতে ইচ্ছা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় কবে দেখা হইবে জানি না।”[৮৪] পুত্রপ্রতিম স্বামী বিরজানন্দজীকে সকরুণ আবেদন করেছিলেন : ‘‘তোমার নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তুমি over work করিয়া শরীরটাকে একেবারে ভাঙ্গিও না। তুমি গেলে মায়াবতী আশ্রমটি উঠিয়া যাইবে নিশ্চয়।... শ্রীশ্রীঠাকুর তোমায় ভাল রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।”[৮৫]

স্বামী সারদানন্দ

বিরজানন্দজীকে তাঁর আবেদন কত আন্তরিক ছিল তা বোঝা যায় শিষ্যস্থানীয় স্বামী বিদ্যানন্দের (রাজেন) প্রয়াণসংবাদ পেয়ে তাঁর শোকপত্রে : ‘‘...শ্রীমান্ বিদ্যানন্দের দেহত্যাগের সংবাদে কতদূর মর্মাহত হইয়াছি তাহা বলিবার নয়।... তাহার অসুস্থতা যে এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তোমাদের পত্রে আমি বুঝিতে পারি নাই।... যাহা হউক, শ্রীশ্রীমার অন্যরূপ ইচ্ছা—তুমি আমি কি করিতে পারি! শ্রীশ্রীমার সেবক তাঁহার শ্রীচরণতলে চিরশান্তি লাভ করিল! আমরা কেবল তাহার গুণগ্রামের কথা অশান্ত হৃদয়ে স্মরণ করিতে রহিলাম।”[৮৬]

সারদানন্দজী শুধু সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীদের জন্যই ভাবিত হতেন না, তিনি তখন সমগ্র রামকৃষ্ণ ভাবধারার অভিভাবক ছিলেন। বিদেশে শ্রীমতী সারা বুলের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তিনি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে লিখেছিলেন : ‘‘মিসেস বুলের বাঁচবার আশাভরসা একরকম ছেড়েই দিয়েচি। বুড়ো বয়সে tuberculosis of stomach or bowels—ক্রিস্টিন লিখেছে। ক্রিস্টিন তাঁর কাছেই আছে। নিবেদিতাও যাচ্চে। নিবেদিতা সেখানে পৌঁছুবার আগেও শরীরত্যাগ হতে পারে—এত বাড়াবাড়ি।”[৮৭]

লোকের দুঃখকষ্টে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। একবার অসুস্থ স্বামীজীর সেবার জন্য তিনি স্বামীজীর সঙ্গে শিমুলতলায় গিয়েছেন। সেখানে দরিদ্র সাঁওতালদের অন্নকষ্ট দেখে এত বিচলিত হন যে তিনি নিজের ভাগের ভাত তাদেরকে বিলিয়ে দিয়ে নিজে শুধু ভাতের ফেন খেয়ে থাকতেন। প্রায় একমাসেরও বেশী তিনি ঐরকম ভাত না খেয়ে ফেন খেয়ে ছিলেন।[৮৮] শ্রীমা শরৎ মহারাজ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন : ‘‘শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক ভারতবর্ষে নাই, সমস্ত পৃথিবীতে নাই, জীবের দুঃখে প্রাণকাঁদা।” শরৎ মহারাজের কয়েকটি চিঠিতেই তাঁর এই মনোভাব স্পষ্ট হয়ে যায় : ‘‘এদিকে দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবার হাতে টাকাও আসিতেছে না যে এই দুঃসময়ে...সাহায্য করি।... অল্পস্বল্প সাহায্য করা হইতেছে। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত চালাইতে পারিলে হয়।”[৮৯]

একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানী, প্রশাসক এবং তাত্ত্বিক রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সম্পাদক স্বামী সারদানন্দ যেমন তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভায় চোখ ধাঁধিয়ে দেন তেমনি আর একদিকে শিশুদের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর আসল শিশুসত্তাটি প্রকাশ পায়। বলরাম বসুর শ্যালককন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর তিনি যেন খেলার সঙ্গী, তার প্রাণের সব কথা প্রকাশ করে বলতে পারা সই। ঠিক এক ক্রীড়োচ্ছল বালকের মতো রাজলক্ষ্মী দেবীকে তিনি পুরী থেকে লিখে পাঠালেন : ‘‘তোমার শশুর মহাশয় এখানে

আসিয়া অনেক ভাল আছেন। একত্রেই আমাদের বসা দাঁড়ান ও খাওয়া দাওয়া হইতেছে।... সে যাহা হউক, একে দাঁত নাই, তার উপর বাঙ্গালে টান কথায়—তোমার শশুরের অর্দ্ধেক কথা আমি বুঝিতে পারি না বাপু। বুড়োকে লইয়া মুস্কিলে পড়া গেছে। ঐজন্য বুড়োর সঙ্গে বেশি কথা কহি না। তুমি একথা শুনে রাগ করবে না ত?... আমি ভুলে গেছি লিখেছ—আচ্ছা রোসো, বুড়োর সঙ্গে ভাব কোরে এবার তোমার শশুরবাড়িতে যাবার জোগাড় করে রাখ্‌চি। যখন যাব তখন ভাল কোরে রেঁধে খাওয়াতে পারবি ত?

''ছিঃ মা লক্ষ্মী অমন কোরে মন খারাপ কি কোর্‌তে আছে। আচ্ছা মন ভাল করবার একটা উপায় তোকে বোলে দিচ্চি—

''যাই মন খারাপ হতে চাইবে অমনি ঠাকুরের ছবির কাছে গিয়ে বল্‌বি, 'ঠাকুর আমি যে তোমাদের রাজলক্ষ্মী, আমার মন ভাল কোরে দাও'—শ্রীশ্রীমাকেও ঐ কথা বল্‌বি—তা হোলেই দেখ্‌বি মন তখনি ভাল হয়ে যাবে।... তোর মন ভাল করবার জন্য কয়েকখানি ছবি ও কয়েকটি গুলি এই সঙ্গে পাঠালুম। পানের সঙ্গে ২টি কোরে গুলি খাবি ও ছবি দেখ্‌বি। তাহা হইলেই ভাল হবে। ২টির বেশি খাস্‌নি যেন।''[৯০]

তার সঙ্গে খুনসুটিও করেছেন : ''মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখ্‌বি। তা না হলে তোর শশুরকে একদিন বেড়াইতে নিয়া গিয়া সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দিব।''[৯১] অন্য একটি চিঠিতে দুষ্টুমি করে লিখছেন : ''আমাদের দেখতে ইচ্ছা করে লিখেচিস্‌। তা বেলুন ত পাঠিয়েছি। তাইতে চড়ে চলে আয় না কেন?''[৯২]

তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে যে-ছোট ছেলেমেয়েরা মিশত, শরৎ মহারাজ নানা গুরুদায়িত্বের মধ্যেও তাদের ভুলতেন না। কোয়ালপাড়ার স্বামী কেশবানন্দকে এক গুরুত্বপূর্ণ পত্রের শেষে বালিকা মাকুর কথা মনে রেখে তিনি লিখেছিলেন : ''মাকুকে বলিবে যে বিড়ালটাকে রাসবিহারী বিদায় করিয়াছিল সে এতদিন পরে আবার আসিয়াছে।''[৯৩] অন্য এক শিষ্যাকে কাশী থেকে মনে করে খবর পাঠাচ্ছেন : ''তোমাদের বড়দি ও চামেলি-দি ভাল আছেন। প্রায়ই দেখা হয়। তাঁরা নিত্য আমাদিগের জন্য কত রকমের তরকারি রাঁধিয়া পাঠাইয়া দিতেছেন। মীনু ও তাহার দিদিমা ভাল আছে ও আছেন।''[৯৪]

আপাতদৃষ্টিতে গম্ভীর হলেও সারদানন্দজীর অন্তর ছিল অত্যন্ত কোমল। কিশোর রামময় প্রথম দর্শনে সারদানন্দজীকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। তা জানতে পেরে শ্রীমা তাঁকে বলেছিলেন ''বোকা ছেলে! শরতের চেহারাই ঐ রকম। ভিতরটা প্রেমে ভরা।... দেখবে শরৎ তোমাকে কত ভালবাসবে।''[৯৫] বাস্তবে নানা কর্মভারে ব্যস্ত এবং ভাব চাপতে দক্ষ সারদানন্দজীর কোমল ভাব খুব বেশি প্রকাশ পেত না। কিন্তু অন্তরঙ্গ কয়েকটি পত্রে তা যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। মাকুর ছেলে ন্যাড়া ছিল শরৎ মহারাজের খুব অনুগত। মহারাজও তাকে খুব ভালবাসতেন। মাঝে মাঝে খবর নিতেন : ''ন্যাড়া কেমন আছে লিখিবে।''[৯৬] মাত্র ক'দিনের জ্বরে ন্যাড়া মারা গেলে শ্রীমা শোকাহত হয়ে কেঁদে মন্তব্য করেছিলেন : ''শরতের খুব লাগবে।'' দেখা যায়, ন্যাড়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শরৎ মহারাজ চিঠিতে লিখেছিলেন : ''তোমার ২২।৪ তারিখের পত্রে ন্যাড়ার শরীরত্যাগের কথা জানিয়া মর্মাহত হইলাম। কি আর লিখিব বল, কিছুই মনে আসিতেছে না। শ্রীশ্রীমার কৃপাপত্রী পাইলাম।''[৯৭] চাপা প্রকৃতির শরৎ মহারাজের কাছে এই সামান্য দীর্ঘশ্বাসই যেন মর্মন্তুদ বেদনার বহিঃপ্রকাশ।

ইতি দাস শরৎ

স্বামী সারদানন্দজীর প্রশংসা শ্রীমা ও স্বামীজী

নিজমুখে করেছেন। তাঁর স্থিরবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাস্তববাদিতা, দূরদৃষ্টি, চৌকস বুদ্ধির সঙ্গে মাতৃসুলভ ভালবাসা, উদারতা, সহানুভূতি এবং সহজাত সমাধিমনস্কতা তাঁকে তাঁর অন্যান্য গুরুভাইদের কাছেও একান্ত নির্ভরযোগ্য করে তুলেছিল। তিনি ছিলেন 'সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের ভারী' এবং সমকালীন তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আদর্শস্থানীয়—কী প্রশাসক রূপে, কী চতুর্যোগ-সমন্বিত অধ্যাত্মপুরুষরূপে। তবু শরৎ মহারাজের মনে এতটুকু অহমিকাবোধ ছিল না। তাঁর এক গুরুভাইকে লিখেছিলেন : ''আমার মত লোকের দ্বারা তাঁহার মিশনের উন্নতি যে কতদূর হইবে তাহাও বুঝিতে পারি না। আজীবন তাঁহার ঘরে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই আমার যথেষ্ট হইবে। কোনরূপ বিঘ্নবাধায় হাল ছাড়িয়া না পালাইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব।''[৯৮] শুধু কর্মী হিসাবেই নয়, সাধকের অহং থেকেও তাঁর হৃদয় ছিল মুক্ত। জীবনের শেষপ্রান্তে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : ''বয়সও পঞ্চাশৎ পার হইয়াছে, এখন 'বনং ব্রজেৎ' করিলেই ভাল হয়।...আশীর্ব্বাদ করিও ভাই যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে ভক্তি বিশ্বাস হয়।''[৯৯]

স্বামীজী একবার মন্তব্য করেছিলেন : ''ঠাকুর রাখালকে এনেছেন, নিজের আনন্দের জন্য—রাখাল তাঁর আনন্দ গোপাল—আর শরৎকে এনেছেন জগতের আনন্দের জন্য। শরৎই আমার নরনারায়ণের সেবার সার্থক রূপ দেবে।''[১০০] *(সমাপ্ত)*

তথ্যসূত্র

৭২। ব্রহ্মচারী প্রকাশচন্দ্র, *স্বামী সারদানন্দ (জীবনকথা)* (বসুমতী সাহিত্য মন্দির : কলকাতা, ১৯৩৬), পৃঃ ৫৩

৭৩। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *স্বামী সারদানন্দের জীবনী* (ক্যালকাটা বুক হাউস : কলকাতা, ১৩৮৪), পৃঃ ৯১

৭৪। স্বামী সারদানন্দ, *পত্রমালা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৯), ভাগ ২, পৃঃ ১২২

৭৫। তদেব, পৃঃ ১৩০

৭৬। তদেব, ভাগ ১, পৃঃ ১০৮

৭৭। তদেব, ভাগ ২, পৃঃ ১৬৫

৭৮। তদেব, পৃঃ ১৬৬

৭৯। তদেব, পৃঃ ৬২

৮০। তদেব, পৃঃ ৩৯

৮১। তদেব, পৃঃ ৬৯

৮২। তদেব, পৃঃ ৭০

৮৩। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে সংরক্ষিত ২৬ ভাদ্র ১৩৩২ সনে লিখিত সারদানন্দজীর শুভেচ্ছালিপি

৮৪। পত্রমালা, ভাগ ২, পৃঃ ৭০

৮৫। তদেব, পৃঃ ৪৯

৮৬। তদেব, ভাগ ১, পৃঃ ১০৯

৮৭। তদেব, ভাগ ২, পৃঃ ৫৫

৮৮। সারদানন্দ জীবনী, পৃঃ ১৭৬

৮৯। পত্রমালা, ভাগ ২, পৃঃ ১২৫

৯০। তদেব, পৃঃ ৬৫-৬৬

৯১। তদেব, পৃঃ ৬৬

৯২। তদেব, পৃঃ ৬৮

৯৩। তদেব, পৃঃ ১২২

৯৪। তদেব, পৃঃ ১৩৫

৯৫। সংকলক ও সম্পাদক : স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৬), পৃঃ ১৩৫

৯৬। *পত্রমালা*, ভাগ ২, পৃঃ ১২২

৯৭। তদেব, ভাগ ১, পৃঃ ১০২

৯৮। তদেব, ভাগ ২, পৃঃ ৩৮

৯৯। তদেব, পৃঃ ৯৪

১০০। *স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা*, পৃঃ ২২৯